দৈনিক বাংলা 14

তারিখ 04 JUN 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

পরীক্ষায় 'কমন' ফেলার দৌড়

এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলোও নেওয়া হয়ে গেছে। দু'একটি পেপার ছাড়া সাধারণভাবে পরীক্ষার্থীদের রায়– প্রশ্নপত্র এবার ভাল হয়েছে।

ভাল প্রশ্নের সংজ্ঞা নিরূপণে একটি মজার ব্যাপার ধরা পড়ে। তা হল প্রশ্ন জটিল কি সহজ, তা আসল নয়, বড় কথা হল প্রশ্ন কতটা পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতির মধ্যে পড়েছে। এই প্রস্তুতির মধ্যে পড়ার নামই 'কমন পড়া'। কমন পড়ার মানে সাজেশনের মধ্যে পড়া।

যদি প্রশ্নগুলো তার ভাব ভাষাসহ চেনা চেনা আদল নিয়ে ধরা দিতে পারে, পরীক্ষার্থী স্বস্তি পায় মনে, খাতা টেনে মুখ না তুলে লিখতে আরম্ভ করে। পুরো সময়টা যেমনটি মুখস্থ করে এসেছে, ঠিক তেমনটি উজাড় করে দিয়ে আসে, এই উজাড় করতে পারাই পরীক্ষার্থীর প্রাপ্তি ও প্রশান্তি।

এখন জিজ্ঞাসা, এমন 'কমন' কতটা সঙ্গত? দীর্ঘ দু'টো বছর পড়ার পর সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের কিছু অজানা বা অপঠিত থাকার কথা নয়; বিশেষত শিক্ষার্থী পাঠ্যসূচীর পুরোটাই পড়বে, এটা প্রত্যাশিত এবং এটা পাঠক্রমের লক্ষ্যও। তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নের ভাব ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য উদ্বেল হতে হবে কেন? একটু ঘুরিয়ে এলেই অচেনা হয়ে যাবে কেন? প্রশ্নের শুরুতে বা শেষে একটু বাড়তি সংযোজন থাকলেই প্রশ্ন অপ্রিয় হয়ে উঠবে কেন? হুবহু এক হয়ে মিলে যাওয়াই কি প্রশ্ন কমন পড়ার বৈশিষ্ট্য?

পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? তারও আগের কথা, পাঠ প্রদানের উদ্দেশ্য কি? স্তরে স্তরে শিক্ষার্থীর জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সহায়ক হওয়া; শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব বিকশিত করা। এই কাজ করার জন্য যেমন পাঠদান–পদ্ধতির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সফলতা অর্জনের মূল্যায়ন। মূল্যায়নের প্রত্যক্ষ মাধ্যম পরীক্ষা। এই সঙ্গেই জড়িত পরিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি— সেই জিজ্ঞাসা।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য ইতিবাচক অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর অজ্ঞতা যাচাই করা বা মূঢ়তার জরীপ করা পরীক্ষার দায় নয়। অধীত জ্ঞানের পরিমাপই এর প্রধান কাজ; পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে স্ফুরিত মেধার বিশ্লেষণও এর বিবেচ্য বিষয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বহু সাধনা–প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ–পরিকল্পণা নির্মিত ও নির্নীত হয়ে থাকে, হয়।

তাহলে অসঙ্গতিটা কোথায়? ক্লাসে–ঘরে খেটে খুটে পড়ে গিয়ে শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে কেন ঠিক যেমনি পড়ে এসেছে, তেমন প্রশ্নটিই চায়? না পেলে মন খারাপ হয়, মাথা ঘুরে যায়? একটু এদিক ওদিক করে তার পাঠের গভীরতা বা বিস্তৃতি পরখ করতে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায়?

কারণ একটি—তা হচ্ছে পাঠদান পদ্ধতির প্রয়োগের ত্রুটি। আমরা স্কুলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু করেই 'জরুরি,' 'অতি–জরুরি,' 'দরকারী,' 'মামুলি,' এ জাতীয় শব্দাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। শিক্ষার্থী এর ফলে চট্ করে পড়ার আগেই পঠিতব্য বিষয়ের অংশগুলোর গুরুত্বের শ্রেণী–ভেদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এমনকি প্রাইমারীর নিচু ক্লাসের শিশু শিক্ষার্থী–ও আর কিছু না জেনে 'ইম্পর্টেন্ট' বলতে শেখে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ভূগোল, ইতিহাস–শিক্ষার সর্বস্তরেই এক কথা সর্বত্র; দরকারী অংশগুলো পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করো। ঐ চিহ্নই সার কথা– শহজাত গুণে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে সম্প্রসারিত হয়– তেমন দরকারী না হলে পড়ে কাজ নেই। দরকার বোধটা মাত্র পরীক্ষার জন্য।

জানা কথা–জ্ঞানের অন্বেষণে এমন সংকোচন বা শর্টকাট পদ্ধতি যে সর্বনাস বয়ে আনে তা বোঝার বয়স, মন, বোধ, বুদ্ধি ছাত্রদের হওয়ার কথা নয়; এ দায়িত্ব পুরোপুরি শিক্ষকের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তায়। সেই আমরাই শিক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেই মাত্র স্থির লক্ষ্য করে পাঠ প্রস্তুতি নিতে দীক্ষা দিই। এই দীক্ষায় দীক্ষিত ও অভ্যস্ত শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে গিয়ে তৈরী করা প্রশ্ন না পেলে 'বানিয়ে' উত্তর দেওয়া হয় বলে ধরে নেয়। তার মনে হয় তার মত করে লিখলে 'বানানো' হয়ে যায় আর তাতে বুঝি উত্তরের মূল্য কমে যায়। অথচ শিক্ষার্থীর দুর্ভাগ্যবশত জানা নেই– মূল্যায়নের নিক্তিতে তার ভাব, তার ভাষা ও তার মতামতই অধিক–তর কদর পায়, যদি তা অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, বিভ্রান্তিকর না হয়; অর্থাৎ যদি তা মোটামুটি সঠিক, বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ও ভাষারীতি প্রথমত শুদ্ধ দ্বিতীয়ত শ্রীমন্ডিত হয়। তথ্য ও প্রকাশভঙ্গী–এ দু'টোই পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষণের রীতি। যিনি পরীক্ষক, তিনি পরীক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা ও পরিবেশ সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবহিত থকেন। (এ অবহিতি সাধারণভাবে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রের নয়) তাই তাঁর প্রত্যাশাও থাকবে তেমনি। মেধা, বুদ্ধিমত্তা সহ পরীক্ষার্থীর মৌলিক গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি তিনি আবিষ্কার করবেন তার লেখায়। তাতেই তার মান নির্ধারণ সম্ভব হয়।

ঘটনা চক্রে আমরা উল্টো রথের যাত্রী। পরীক্ষাপত্রে অত্যুজ্জ্বল মানের লেখা পেতে আমরা আশা করি। আমরা এমন করি প্রধানত দু'টো কারণে। এক, আমাদের সমাজে সম্ভাব্য উত্তরের তালিকা দিয়ে বিজ্ঞজনের তৈরী করা নোট দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের রীতি চালু আছে। চড়াই উৎরাইয়ে এসব নানা নামে আজও টিকে আছে। আসলে অবস্থা এমন যে, বললে বাড়িয়ে বলা হবে না—' প্রশ্ন প্রণয়ন–কারীরা প্রশ্ন করতে বসে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত সহায়ক বা গাইড বইয়ের অথবা নোট বইয়ের সাহায্য নিয়ে থাকেন। যাতে করে 'আনকমন' তথা কঠিন প্রশ্নের প্রনেতা হওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচেন। এই এক নম্বরের কারণই আমাদের দু'নম্বর আচরণের উৎস। বাজারে বই পাওয়া যায় বলে আমাদের প্রত্যাশা থাকে পরীক্ষার্থীদের কাছে সেও এসএসসির পশ্নের জবাব উচ্চমানে দেবে। যেহেতু অনেকেই খাতায় সাজানো গোছানো রেফারেন্স সমৃদ্ধ নোট লিখছে, সেহেতু পরীক্ষার হলে বসে নিজ ভাষায় লেখে যে ছেলে, তাতে মনভরানো কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে মাত্রই প্রবল তৃষিত হয়ে থাকে মূল গ্রন্থ ছাড়িয়ে সহায়ক গ্রন্থের জন্য।

পাঠ্য বিষয় সংকুচিত করে পাঠদান অর্থাৎ বেছে বেছে পড়ানোর প্রবণতা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আচার্য অব–দান। যদিও বিধান তা নয়। তা ঐ সব বিধান যেন চিকিৎসকের প্রেসক্রিপ–শনের মতই তত্ত্বসর্বস্ব— এ সব তত্ত্ব প্রয়োগে আমরা অনীহ। এর কারণ যাই হোক, এ সত্য অস্বীকারের পথ নেই যে, পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগের সাজেশান ও পরীক্ষায় কমন পড়ার যাঞ্চার জন্য ছাত্রছাত্রীদের দায়ী করা অন্যায়।

কেবল নোট বই বা গাইড বুক নয়, পরীক্ষার হলে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা পাওয়ার জন্য আমাদের রয়েছে আরও ব্যাপক আয়োজনঃ টেস্ট–পেপার, কোচিং সেন্টার, স্পেশাল কোচিং, প্রাইভেট–কোচিং। এই সকল কিছুর আদর্শ অভিন্নঃ পরীক্ষার্থীর জন্য পরী–ক্ষার হলের সম্ভব্য প্রশ্ন তালিকার নিশ্চিত বিধান।

পরীক্ষার আগে এ কারণেই এমন সাজেশান দেয়া–নেয়া সর্বজনস্বীকৃত। এ কালে এটা সিদ্ধ রেওয়াজ। অবস্থা ক্রমে এমন জায়গায় পৌছেছে যে কোন বিশেষ শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সাজেশানের খুব বেশী চাহিদা। আর তা গৌরবের–ও।

এ পর্যন্তও চলছিল ভালোই––কিন্তু পার্থিব কোনও আচরণই যে সীমার মধ্যে থাকে না, থাকতে জানে না। তাই কেবল প্রশ্ন তালিকা নয়, এখন চাই নিশ্চিত প্রশ্ন। সেই সঙ্গে চাই প্রশ্নের জবাব লিখে দেয়া–ও। এমন জবাব যা বাজারে বইয়ে নেই, যা নতুন, সুন্দর ও অনুপম। যা পরীক্ষক পড়ে চমৎকৃত হবেন এবং পরীক্ষার্থীর লেখা নয় জেনেও তাকে ভালো নম্বর দেবেন। অর্থাৎ নম্বর দিই আমরা ছাত্রের সৃজনী শক্তি বা মৌলিকতাকে নয়, তার সংগ্রহ করার অপার অধ্যাবসায় ও গুণকে কিংবা তেমন করতে পারার জন্য তার বাবার অর্থ সামর্থকে।

এমন প্রেক্ষিতে আমরা পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার হলে প্রশ্ন কমন পড়ার জন্য উৎকণ্ঠাকে ঠুকি কোন যুক্তিতে। কোন যুক্তিতেই বা সেমিনার করে বলাবলি করি, শিক্ষা জিনিসটা ক্রমেই কৃত্রিম হয়ে উঠছে––মুখস্থ বিদ্যাও নির্ধারিত প্রশ্ন–চর্চা দিয়ে ছাত্র সমাজ মেকী ডিগ্রীধারী হচ্ছে। এমনও হয়, হচ্ছে কোথায়ও কোথায়ও কষ্ট করে পরীক্ষার্থী আর হলেও যায় না, পরিবর্তে লেখেন অন্য জন। অবশ্য এখানেও খেলা খেলে কড়ি কাঞ্চন। কড়ি ফান্টনের প্রাধান্যকে এক তরফা দায় দিয়েও লাভ নেই—অর্থবল চিরকালই একটি শ্রেণীর ছিল––কিন্তু অর্থ দিয়ে শিক্ষা ক্রয়ের মানসিকতা সাম্প্রতিক কালের। মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে পাশ কাটান অনেকে, কিন্তু এ–ও তো মাত্র সান্তনা বা সাফাই, সমাধান কোথায়?

এমনিতেও এই প্রজন্ম শ্রম বিমুখ। দু'পাতা লিখতে পরাঙ্মুখ। তৈরি করা সারমর্ম এনে দিলে তবু তথাস্তু, নইলে নয়। শির খাটালে শিঃরপীড়া হয়। শ্রবণ ও দর্শণ এখন প্রধান। চোখ দিয়ে পড়া ও মন দিয়ে অনুধাবনের দিন অস্তাচলে। এই জেনারেশন রাত জেগে বা দিনভর ভিডিও ক্যাসেট দেখে–কিন্তু গ্রন্থ দূরের কথা, সংবাদপত্রও তেমন পড়ে না। কারণ তাতে ক্লান্তি আসে। নামতা মুখস্থের বালাই নেই। কবিতা মুখস্থ আজকাল এসএসসিতেও উঠে গেছে।

তাই পরীক্ষা–পরীক্ষার্থী–পরিক্ষক–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে–পরিকল্পনায় সিদ্ধান্তে ব্যালেন্স রাখা। একটির সমাধানে অন্য সংকট যেন মাথা চাড়া না দিতে পারে। সংকট কি ও কেন ধরতে পারলে তার এমন সমাধান ধরা দিতে বাধ্য–যা কোনও পার্শ্ব সংকট বা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। যা সত্যি সত্যি দিক দিশারী হয়ে শুভ ফল দেবে এবং যা যুগ–কাল সঙ্গ–সাহচর্য এসব অসার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করবে, করতে পারবে।

—হোসনে আরা শাহেদ